দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এবমাবিষ্কৃতাশেষগুণকর্মোদয়ো মুনিম্ ।
সব্রীড় ইব তং সম্রাড়ুপারতমুবাচ হ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আবিষ্কৃত**—বর্ণনা করার পর; **অশেষ**—সমস্ত; **গুণ**—গুণের; **কর্ম**—কার্যকলাপের; **উদয়ঃ**—মহিমা; **মুনিম্**—মহর্ষি; **সব্রীড়ঃ**—লজ্জিত হয়ে; **ইব**—যেন; **তম্**—তাঁকে (কর্দম); **সম্রাট্**—সম্রাট মনু; **উপারতম্**—মৌন; **উবাচ হ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—সম্রাটের অশেষ গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা বর্ণনা করে, ঋষি মৌন হলেন, এবং সম্রাট মনু নিজের প্রশংসা শ্রবণ করে, লজ্জিত হয়ে ঋষিকে বললেন।

শ্লোক ২

মনুরুবাচ

ব্রহ্মাসৃজৎস্বমুখতো যুষ্মানাত্মপরীপ্সয়া ।
ছন্দোময়স্তপোবিদ্যাযোগযুক্তানলম্পটান্ ॥ ২ ॥

মনুঃ—মনু; **উবাচ**—বললেন; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **স্ব-মুখতঃ**—তাঁর মুখ থেকে; **যুষ্মান্**—আপনাদের (ব্রাহ্মণদের); **আত্ম-পরীপ্সয়া**—নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিস্তার করে; **ছন্দঃ-ময়ঃ**—বেদরূপ; **তপঃ-বিদ্যা-যোগ-যুক্তান্**—তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত; **অলম্পটান্**—ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি বিমুখ।

অনুবাদ

মনু উত্তর দিলেন, বেদরূপ ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করার জন্য তাঁর মুখ থেকে আপনার মতো ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি পরাঙ্মুখ।

তাৎপর্য

বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিন্ময় জ্ঞানের বিস্তার করা। ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছিল পরম পুরুষের মুখ থেকে, এবং তাই তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার করা। ভগবদ্গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *(যোগযুক্তানলম্পটান্)* ব্রাহ্মণেরা যোগ-শক্তি সমন্বিত এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। প্রকৃত পক্ষে দুই প্রকার বৃত্তি রয়েছে। তার একটি হচ্ছে জাগতিক, এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন, এবং অপরটি হচ্ছে পারমার্থিক—পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগে লিপ্ত তাদের বলা হয় অসুর, এবং যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, অথবা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেন, তাঁদের বলা হয় সুর। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে বিরাট পুরুষের মুখ থেকে; তেমনই ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্যদের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর জঘন থেকে, এবং শূদ্রদের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর পা থেকে। ব্রাহ্মণদের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে তপশ্চর্যা ও জ্ঞান আহরণ করা, এবং সব রকম ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে বিমুখ থাকা।

শ্লোক ৩

তৎত্রাণায়াসৃজচ্চাস্মান্দোঃসহস্রাৎসহস্রপাৎ ।
হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম ক্ষত্রমঙ্গং প্রচক্ষতে ॥ ৩ ॥

তৎ-ত্রাণায়—ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **চ**—এবং; **অস্মান্**—আমাদের (ক্ষত্রিয়দের); **দোঃ-সহস্রাৎ**—তাঁর সহস্র বাহু থেকে; **সহস্র-পাৎ**—সহস্র পদ-বিশিষ্ট পরম পুরুষ (বিশ্বরূপ); **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **তস্য**—তাঁর; **হি**—জন্য; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়; **অঙ্গম্**—বাহু; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য, সহস্রপাৎ পরমেশ্বর তাঁর সহস্র বাহু থেকে আমাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণদের বলা হয় তাঁর হৃদয় এবং ক্ষত্রিয়দের বলা হয় তাঁর বাহু।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা, কেননা ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা হলে সমাজের মাথাকে রক্ষা করা হয়। ব্রাহ্মণদের সমাজরূপ শরীরের মস্তক বলে মনে করা হয়। মাথা যদি খারাপ না হয়ে গিয়ে সুস্থ এবং স্বচ্ছ থাকে, তা হলে সব কিছুই ঠিক থাকে। তাই ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ* । এই প্রার্থনার তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভগবান বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের রক্ষা করেন, তার পর তিনি সমাজের অন্য সদস্যদের *(জগদ্ধিতায়)* রক্ষা করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জগতের মঙ্গল নির্ভর করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার উপর; তাই মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গো-রক্ষা। ক্ষত্রিয়দের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের পরম ইচ্ছা অনুসারে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা—*গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ* । শরীরের মধ্যে যেমন হৃদয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তেমনই মানব-সমাজে ব্রাহ্মণেরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছেন অনেকটা সমস্ত শরীরের মতো; যদিও সমস্ত শরীরটির আয়তন হৃদয় থেকে বড়, তবুও হৃদয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শ্লোক ৪

অতো হ্যন্যোন্যমাত্মানং ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ রক্ষতঃ ।
রক্ষতি স্মাব্যয়ো দেবঃ স যঃ সদসদাত্মকঃ ॥ ৪ ॥

অতঃ—অতএব; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়; **চ**—এবং; **রক্ষতঃ**—রক্ষা করে; **রক্ষতি স্ম**—রক্ষা করে; **অব্যয়ঃ**—নির্বিকার; **দেবঃ**—ভগবান; **সঃ**—তিনি; **যঃ**—যিনি; **সৎ-অসৎ-আত্মকঃ**—কার্য-কারণরূপ।

অনুবাদ

সেই জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পরস্পরকে রক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করেন; এবং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি কার্য ও কারণরূপ হওয়া সত্ত্বেও অব্যয়, প্রকৃত পক্ষে তিনিই পরস্পরের মাধ্যমে তাঁদেরকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

বর্ণ এবং আশ্রম-ভিত্তিক সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা সকলকে পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার একটি সহযোগিতাপূর্ণ পন্থা। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা, এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের জ্ঞান দান করা। যখন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা পরস্পরের সঙ্গে সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেন, তখন অন্যান্য ন্যূনতর বর্ণগুলি, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা, আপনা থেকেই উন্নতি লাভ করে। সমগ্র বৈদিক সমাজ তাই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা, কিন্তু তিনি এই রক্ষা-কার্যের প্রতি অনাসক্ত। তিনি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করার জন্য, এবং ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য। তিনি নিজে এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন; তাই, তাঁকে বলা হয় *নির্বিকার* । তাঁর করণীয় কিছু নেই। তিনি এতই মহান যে, তিনি নিজে কোন কর্ম সম্পাদন করেন না, কিন্তু তাঁর শক্তির দ্বারা তিনি সব কিছু করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এবং আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তি।

যদিও জীবাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ব্যক্তিগতভাবে একটি জীবাত্মা অপর জীবাত্মা থেকে গুণ অনুসারে ভিন্ন হতে পারে অথবা ভিন্ন কার্য করতে পারে, যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কিন্তু যখন এই বিভিন্ন আত্মাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক আত্মার সঙ্গে বিরাজমান, তিনি প্রসন্ন হন এবং সর্বতোভাবে তাঁদের রক্ষা করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ভগবানের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বক্ষ থেকে অথবা বাহু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। যদি বিভিন্ন বর্ণ বা সমাজের বিভাগগুলি, আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণরূপে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তা হলে ভগবান প্রসন্ন হন। এইটি হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য। যদি বিভিন্ন আশ্রম এবং বর্ণের সদস্যেরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেন, তখন ভগবান সেই সমাজকে রক্ষা করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দেহের মালিক। জীবাত্মা তার নিজের দেহের মালিক, কিন্তু ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, "হে ভারত! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ।" ক্ষেত্রজ্ঞ মানে হচ্ছে শরীরের জ্ঞাতা অথবা স্বামী। জীবাত্মা তার নিজের শরীরটির মালিক, কিন্তু পরমাত্মা বা

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র সমস্ত শরীরের মালিক। তিনি কেবল মনুষ্য শরীরেরই মালিক নন, উপরন্তু পক্ষী, পশু এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের মালিক। কেবল এই গ্রহেই নয়, অন্যান্য সমস্ত গ্রহেও। তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর; তাই পৃথক পৃথক জীবেদের রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে বিভক্ত হতে হয় না। তিনি একই থাকেন। মধ্যাহ্নে সূর্য সকলের মাথার উপরে থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সূর্য বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ মনে করতে পারে যে, সূর্য কেবল তার মাথার উপরেই রয়েছে, কিন্তু পাঁচ হাজার মাইল দূরে আর এক ব্যক্তিও মনে করতে পারে যে, সূর্য কেবল তারই মাথার উপরে রয়েছে। তেমনই, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এক, কিন্তু মনে হয় যেন তিনি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি জীবের তত্ত্বাবধান করছেন। তার অর্থ এই নয় যে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক। তাঁরা উভয়েই আত্মা, অতএব গুণগতভাবে তাঁরা এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে তাঁরা ভিন্ন।

শ্লোক ৫

তব সন্দর্শনাদেবচ্ছিন্না মে সর্বসংশয়াঃ ।
যৎস্বয়ং ভগবান্ প্রীত্যা ধর্মমাহ রিরক্ষিষোঃ ॥ ৫ ॥

তব—আপনার; সন্দর্শনাৎ—দর্শনের ফলে; এব—কেবল; ছিন্নাঃ—দূর হয়েছে; মে—আমার; সর্ব-সংশয়াঃ—সমস্ত সন্দেহ; যৎ—যতখানি; স্বয়ম্—ব্যক্তিগতভাবে; ভগবান্—আপনি; প্রীত্যা—প্রীতিপূর্বক; ধর্মম্—কর্তব্য; আহ—বিশ্লেষণ করেছেন; রিরক্ষিষোঃ—প্রজাপালনে উৎসুক রাজার।

অনুবাদ

আপনার দর্শনের ফলেই কেবল আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, কেননা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক প্রজাপালনে আগ্রহী রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তাৎপর্য

মনু এখানে সাধু মহাপুরুষের দর্শনের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা সাধু-সঙ্গ করার চেষ্টা করা, কেননা যদি ক্ষণিকের জন্যও যথাযথভাবে সাধু ব্যক্তির সঙ্গ হয়, তা হলে সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়। যেভাবেই হোক না কেন, যদি সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কৃপা

লাভ হয়, তা হলে মনুষ্য-জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হয়। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনুর এই উক্তির প্রমাণ আমরা পেয়েছি। একবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল, এবং প্রথম দর্শনেই তিনি তাঁর বিনীত দাসকে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই ব্যাপারে আমার কোন প্রস্তুতি ছিল না, কিন্তু যেহেতু কোন কারণে তিনি সেই বাসনা করেছিলেন, তাই তাঁর কৃপায় তাঁর সেই আদেশ পালনে আমরা এখন যুক্ত হয়েছি। তার ফলে আমরা এক দিব্য কার্য পেয়েছি এবং তিনি আমাদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। তাই, সর্বতোভাবে চিন্ময় সেবায় প্রবৃত্ত কোন সাধুর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কৃপা লাভ হয়, তা হলে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়। যদি সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সৌভাগ্য হয়, তা হলে সহস্র জন্মেও যা সম্ভব নয়, তা এক পলকের মধ্যে লাভ হয়ে যায়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা সাধু-সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত এবং বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, কেননা সাধুর একটি কথাতেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারা যায়। তাঁর পারমার্থিক প্রগতির ফলে, বদ্ধ জীবকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করার ক্ষমতা সাধুর রয়েছে। এখানে মনু স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়েছে কেননা কর্দম মুনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক জীবাত্মার বিভিন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬

দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দর্শো যোঽকৃতাত্মনাম্ ।
দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্ ॥ ৬ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের ফলে; **মে**—আমার; **ভগবান্**—সর্ব শক্তিমান; **দৃষ্টঃ**—দর্শন হয়েছে; **দুর্দর্শঃ**—যাঁকে সহজে দেখা যায় না; **যঃ**—যিনি; **অকৃত-আত্মনাম্**—যাদের মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত নয়; **দিষ্ট্যা**—আমার সৌভাগ্যের ফলে; **পাদ-রজঃ**—পদধূলি; **স্পৃষ্টম্**—স্পর্শ করে; **শীর্ষ্ণা**—মস্তকের দ্বারা; **মে**—আমার; **ভবতঃ**—আপনার; **শিবম্**—সর্ব মঙ্গলপ্রদ।

অনুবাদ

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন লাভ করেছি, কেননা যারা তাদের মনকে দমন করেনি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেনি, তাদের পক্ষে আপনার

দর্শন লাভ করা দুষ্কর। এইটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার পবিত্র পদধূলি আমার মস্তক দ্বারা স্পর্শ করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের পবিত্র ধূলি স্পর্শ করার মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনের সিদ্ধি লাভ হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *মহৎপাদরজোঽভিষেকম্*, অর্থাৎ, মহৎ বা মহান ভক্তের চরণের পবিত্র ধূলির দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার ফলে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *মহাত্মানস্তু*—যাঁরা মহাত্মা তাঁরা ভগবানের দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, এবং তাঁদের লক্ষণ হচ্ছে যে, তাঁরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাই তাদের বলা হয় মহৎ। মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য না হলে, পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

পারমার্থিক সাফল্যের জন্য গুরু-পরম্পরা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। মহৎ গুরুদেবের কৃপার ফলেই কেবল মহৎ হওয়া যায়। কেউ যদি মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে মহাত্মায় পরিণত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা থাকে। মহারাজ রহূগণ যখন জড়ভরতকে তাঁর আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিক সাফল্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি রাজাকে উত্তর দিয়েছিলেন যে, কেবল ধর্ম আচরণ অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ অথবা শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করা যায় না। এই সমস্ত পন্থাগুলি নিঃসন্দেহে পারমার্থিক উপলব্ধির সহায়ক, কিন্তু প্রকৃত সাফল্য লাভ হয় মহাত্মার কৃপায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গুর্বষ্টকমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল গুরুদেবের প্রসাদেই জীবনের পরম সাফল্য লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করা সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করতে না পারেন, তা হলে তাঁর পক্ষে পারমার্থিক সাফল্য লাভ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এখানে *অকৃতাত্মনাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *আত্মা* মানে হচ্ছে 'দেহ', 'আত্মা' অথবা 'মন', এবং *অকৃতাত্মা* মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা তাদের ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করতে পারে না। যেহেতু সাধারণ মানুষেরা তাদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে অক্ষম, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে মহাত্মা অথবা ভগবানের মহান ভক্তের আশ্রয় অন্বেষণ করা এবং তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা। তার ফলে তাদের জীবন সার্থক হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে বিধি-নিষেধ এবং ধর্মনীতি অনুশীলন করার ফলে, পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। তাকে সদ্গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করে, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হবে; তা হলেই সে নিঃসন্দেহে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৭

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোঽহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্ ।
অপাবৃতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুষ্টা দিষ্ট্যোশতীর্গিরঃ ॥ ৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনুশিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **অহম্**—আমি; **কৃতঃ**—অর্পিত; **চ**—এবং; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **মহান্**—মহান; **অপাবৃতৈঃ**—অনাবৃত; **কর্ণ-রন্ধ্রৈঃ**—কর্ণ-কুহরের দ্বারা; **জুষ্টাঃ**—গ্রহণ করা হয়েছে; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের ফলে; **উশতীঃ**—শুদ্ধ; **গিরঃ**—বাণী।

অনুবাদ

আমার সৌভাগ্যের ফলে আমি আপনার উপদেশ লাভ করেছি, এবং এইভাবে আপনি আমার উপর মহৎ কৃপা বর্ষণ করেছেন। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে, আমি অনাবৃত কর্ণ-কুহরের দ্বারা আপনার বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন, কিভাবে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর সঙ্গে আচরণ করতে হয়। প্রথমে, পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তিকে এক সদ্গুরুর অন্বেষণ করতে হয়, এবং তার পর আগ্রহ সহকারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে হয় এবং তা সম্পাদন করতে হয়। এইটি পারস্পরিক সেবা। সদ্গুরু অথবা মহাত্মা সর্বদা তাঁর কাছে আগত সাধারণ মানুষের উন্নতি সাধন করতে চান। যেহেতু সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তাদের প্রকৃত কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির কথা ভুলে গেছে, তাই সাধুরা সর্বদাই চান যে, অন্য সকলেই যেন সাধুতে পরিণত হয়। সাধুর কাজ হচ্ছে প্রতিটি আত্ম-বিস্মৃতি-পরায়ণ মানুষের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করা।

মনু বলেছেন যে, যেহেতু তিনি কর্দম মুনি কর্তৃক আদিষ্ট এবং উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ বলে মনে করেছেন। তিনি তাঁর বাণী শ্রবণ করার ফলে, নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্মুক্ত কর্ণ-বিবরের দ্বারা সদ্গুরু মহাজনের কাছ থেকে শ্রবণ করার জন্য অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হওয়া উচিত। তা কিভাবে গ্রহণ করা উচিত? সেই চিন্ময় বাণী শ্রবণের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত। *কর্ণরন্ধ্রৈঃ* শব্দটির

অর্থ হচ্ছে 'কর্ণ-বিবরের দ্বারা'। গুরুদেবের কৃপা কর্ণ ব্যতীত দেহের অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা লাভ করা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গুরুদেব কয়েকটি ডলারের বিনিময়ে কানে কানে বিশেষ মন্ত্র দেন, এবং সেই মন্ত্রের ধ্যান করার ফলে, মানুষ ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধি লাভ করে ভগবান হয়ে যায়। কর্ণের দ্বারা এইরূপ গ্রহণ সম্পূর্ণ মেকি। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, সদ্‌গুরু কোন বিশেষ মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে জানেন এবং কিভাবে তাকে কৃষ্ণ-সেবায় কোন কর্তব্যে নিযুক্ত করতে হবে তাও তিনি জানেন, এবং সেই অনুসারে তিনি তাকে নির্দেশ দেন। তিনি সেই নির্দেশ দেন তার কর্ণের মাধ্যমে, গোপনে নয়, সর্বসমক্ষে। "কৃষ্ণের জন্য তুমি এই ধরনের সেবা করার উপযুক্ত, অতএব তুমি এইভাবে সেবা কর।" তিনি একজনকে আদেশ দেন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবা করতে, অন্য আর একজনকে উপদেশ দেন কৃষ্ণভাবনায় সম্পাদকের কাজ করতে, আর একজনকে আদেশ দেন প্রচার করতে, এবং অন্য আর একজনকে নির্দেশ দেন কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের ভোগ রন্ধন করতে। কৃষ্ণভক্তির বহু বিভাগ রয়েছে, এবং সদ্‌গুরুদেব বিশেষ মানুষের বিশেষ যোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত হয়ে, তাকে এমনভাবে শিক্ষা দেন যে, তার প্রবণতা অনুসারে আচরণ করেই সে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। *ভগবদ্‌গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিজের যোগ্যতা অনুসারে সেবা করার মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়, ঠিক যেমন অর্জুন তাঁর সামরিক দক্ষতার মাধ্যমে কৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। অর্জুন একজন পূর্ণ সৈনিকরূপে তাঁর সেবা নিবেদন করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তেমনই, একজন শিল্পী তার গুরুর নির্দেশ অনুসারে শিল্প-চর্চার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। কেউ যদি লেখক হন, তা হলে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করতে পারেন। কিভাবে নিজের ক্ষমতা অনুসারে কার্য করা উচিত, সেই নির্দেশ গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হবে, কেননা গুরুদেব সেই প্রকার উপদেশ দানে অত্যন্ত পারদর্শী।

গুরুদেবের নির্দেশ এবং শ্রদ্ধা সহকারে শিষ্যের সেই নির্দেশ পালন, এই দুয়ের সমন্বয়ে এই পন্থাটি সার্থক হয়। *ভগবদ্‌গীতার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ* শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যখন পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁকে অবশ্যই তাঁর বিশেষ সেবা সম্বন্ধে গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে সেই বিশেষ নির্দেশ সম্পাদন করতে চেষ্টা করতে হবে এবং সেই নির্দেশটিকে তাঁর জীবন-সর্বস্ব বলে মনে করতে হবে। শ্রদ্ধা সহকারে গুরুর নির্দেশ পালন

করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য, এবং তার ফলে তাঁর সর্ব সিদ্ধি লাভ হবে। শ্রীগুরুদেবের বাণী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে শ্রবণের মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তা সম্পাদন করা উচিত। তা হলেই জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৮

স ভবান্দুহিতৃস্নেহপরিক্লিষ্টাত্মনো মম ।
শ্রোতুমর্হসি দীনস্য শ্রাবিতং কৃপয়া মুনে ॥ ৮ ॥

সঃ—আপনি স্বয়ং; **ভবান্**—আপনি; **দুহিতৃ-স্নেহ**—কন্যার প্রতি স্নেহবশত; **পরিক্লিষ্ট-আত্মনঃ**—যাঁর মন ব্যাকুল হয়েছে; **মম**—আমার; **শ্রোতুম্**—শুনে; **অর্হসি**—প্রসন্ন হন; **দীনস্য**—দীন আমার প্রতি; **শ্রাবিতম্**—প্রার্থনা; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **মুনে**—হে ঋষি।

অনুবাদ

হে মহর্ষি। কৃপাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আপনি আমার বিনীত নিবেদন শ্রবণ করুন, কেননা আমার কন্যার প্রতি স্নেহবশত আমার মন ব্যাকুল হয়েছে।

তাৎপর্য

শিষ্য যখন তার গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিষ্ঠাপূর্বক তা সম্পাদন করে, তখন তার গুরুদেবের কাছ থেকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা করার অধিকার তার হয়। সাধারণত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অথবা সদ্‌গুরুর শুদ্ধ শিষ্য ভগবান অথবা গুরুদেবের কাছ থেকে কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না, কিন্তু যদি গুরুদেবের কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করার প্রয়োজনও হয়, তা হলেও গুরুদেবকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট না করে, তা প্রার্থনা করা যায় না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহবশত যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তাঁর মনের সেই কথা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম ।
অন্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

প্রিয়ব্রত-উত্তানপদোঃ—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের; **স্বসা**—ভগ্নী; **ইয়ম্**—এই; **দুহিতা**—কন্যা; **মম**—আমার; **অন্বিচ্ছতি**—অন্বেষণ করছে; **পতিম্**—পতির; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **বয়ঃ-শীল-গুণ-আদিভিঃ**—বয়স, চরিত্র, সদ্‌গুণাবলী ইত্যাদি সমন্বিত।

অনুবাদ

আমার এই কন্যাটি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী। সে বয়স, চরিত্র এবং সদ্‌গুণ-সমন্বিত উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনুর যুবতী কন্যা দেবহূতি ছিলেন সৎ চরিত্রা এবং সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিতা; তাই তিনি বয়সে, গুণাবলীতে এবং চরিত্রে তাঁর উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছিলেন। মনু তাঁর কন্যাকে দুই মহান রাজা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী বলে পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মুনিকে আশ্বস্ত করা যে, সেই কন্যাটি ছিলেন অতি উচ্চ কুলোদ্ভূতা। দেবহূতি ছিলেন তাঁর কন্যা এবং দুই ক্ষত্রিয় মহান রাজার ভগ্নী; তিনি কোন নীচ কুলোদ্ভূতা ছিলেন না। মনু তাই কর্দমের উপযুক্ত বলে মনে করে, তাঁর কন্যাটিকে তাঁর হস্তে অর্পণ করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, যদিও কন্যাটি বয়সে এবং গুণে পরিণত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রভাবে পতির অন্বেষণে বের হননি। তিনি তাঁর বয়স, চরিত্র, এবং গুণের অনুকূলে উপযুক্ত পতির বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং তাঁর পিতা নিজে তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহ-পরবশ হয়ে, উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

যদা তু ভবতঃ শীলশ্রুতরূপবয়োগুণান্ ।
অশৃণোন্নারদাদেষা ত্বয্যাসীৎকৃতনিশ্চয়া ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু; **ভবতঃ**—আপনার; **শীল**—উন্নত চরিত্র; **শ্রুত**—বিদ্যা; **রূপ**—সুন্দর রূপ; **বয়ঃ**—যৌবন; **গুণান্**—গুণাবলী; **অশৃণোৎ**—শুনেছিল; **নারদাৎ**—নারদ মুনির কাছ থেকে; **এষা**—দেবহূতি; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কৃত-নিশ্চয়া**—দৃঢ়সঙ্কল্প।

অনুবাদ

যে মুহূর্তে সে নারদ মুনির কাছ থেকে আপনার উন্নত চরিত্র, বিদ্যা, রূপ, বয়স ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করে, তখন থেকে সে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করবে বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে।

তাৎপর্য

দেবহূতি কর্দম মুনিকে চাক্ষুষ দর্শন করেননি, এমন কি তাঁর চরিত্র এবং গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না, কেননা সে-সম্বন্ধে জানবার মতো কোন সামাজিক সাক্ষাৎকার তাঁদের মধ্যে হয়নি। কিন্তু তিনি নারদ মুনির কাছে কর্দম মুনির কথা শ্রবণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকেও মহাজনের কাছ থেকে শ্রবণ করাই হচ্ছে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি নারদ মুনির কাছে শুনেছিলেন যে, কর্দম মুনি তাঁর পতি-হবার উপযুক্ত; তাই তিনি তাঁর অন্তর থেকে তাঁকেই বিবাহ করার সঙ্কল্প করেছিলেন, এবং তাঁর সেই বাসনা তিনি তাঁর পিতার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, এবং তাঁর পিতা তখন তাঁকে কর্দম মুনির কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১১

তৎপ্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপহৃতাং ময়া ।
সর্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্মসু ॥ ১১ ॥

তৎ—তাই; **প্রতীচ্ছ**—দয়া করে গ্রহণ করুন; **দ্বিজ-অগ্র্য**—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ইমাম্**—তাকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপহৃতাম্**—পুরস্কার-স্বরূপ প্রদত্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **অনুরূপাম্**—উপযুক্ত; **তে**—আপনার জন্য; **গৃহ-মেধিষু**—গৃহস্থের উপযুক্ত; **কর্মসু**—কর্তব্য কর্মের।

অনুবাদ

অতএব, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি একে গ্রহণ করুন, কেননা আমি শ্রদ্ধা সহকারে আপনার কাছে একে নিবেদন করছি। আমার এই কন্যা সর্বতোভাবে আপনার পত্নী হওয়ার উপযুক্ত এবং সে আপনার গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

তাৎপর্য

গৃহমেধিষু কর্মসু কথাটির অর্থ হচ্ছে 'গৃহস্থালির কর্তব্য কর্মে।' এখানে আর একটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে—*সর্বাত্মনানুরূপাম্* । এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, কেবল বয়স এবং গুণাবলীতেই পতির উপযুক্ত হলে হবে না, তাকে অবশ্যই তার গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনেও সহায়ক হতে হবে। মানুষের গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা নয়, উপরন্তু স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা সহ অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা। যারা তা করে না, তারা গৃহস্থ নয়, তারা হচ্ছে *গৃহমেধী*। সংস্কৃত ভাষায় দুইটি শব্দের ব্যবহার হয়—একটি হচ্ছে গৃহস্থ এবং অন্যটি হচ্ছে *গৃহমেধী*। গৃহমেধী এবং গৃহস্থের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, গৃহস্থ একটি আশ্রম বা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের স্থান, কিন্তু কেউ যদি গৃহে বসবাস করে কেবল তার ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধন করে, তা হলে সে হচ্ছে *গৃহমেধী*। *গৃহমেধীর* পক্ষে পত্নীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে উপযুক্ত পত্নী হচ্ছেন পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যকলাপে সর্বতোভাবে সহায়ক একজন সহকারী। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থালির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা, এবং পতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে সাহায্য করা, কিন্তু বয়সে, শীলে এবং গুণে যদি তিনি তাঁর স্বামীর সমকক্ষ না হন, তা হলে তিনি তাঁর পতিকে সাহায্য করতে পারেন না।

শ্লোক ১২

উদ্যতস্য হি কামস্য প্রতিবাদো ন শস্যতে ।
অপি নির্মুক্তসঙ্গস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ ॥ ১২ ॥

উদ্যতস্য—যা আপনা থেকেই এসেছে; **হি**—প্রকৃত পক্ষে; **কামস্য**—জড় বাসনার; **প্রতিবাদঃ**—প্রত্যাখ্যান; **ন**—না; **শস্যতে**—প্রশংসনীয়; **অপি**—যদিও; **নির্মুক্ত**—মুক্ত ব্যক্তির; **সঙ্গস্য**—আসক্তি থেকে; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখ; **রক্তস্য**—আসক্ত; **কিম্ পুনঃ**—কি বলার আছে।

অনুবাদ

যেহেতু বিষয়ের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিরও আপনা থেকে উপস্থিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, অতএব যে কামাসক্ত তার সম্বন্ধে আর কি বলার আছে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবনে সকলেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে অভিলাষী; তাই, কেউ যখন ইন্দ্রিয় উপভোগের কোন বস্তু বিনা প্রচেষ্টায় লাভ করেন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কর্দম মুনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, তবুও তিনি বিবাহ করার বাসনা করেছিলেন এবং ভগবানের কাছে উপযুক্ত পত্নীর প্রার্থনা করেছিলেন।

সেই কথা স্বায়ম্ভুব মনু জানতেন। তাই তিনি পরোক্ষভাবে কর্দম মুনিকে আশ্বাস দিয়েছেন—"আপনি আমার কন্যার মতো এক উপযুক্ত পত্নী আকাঙ্ক্ষা করেছেন, এবং এখন সে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনার প্রার্থনা এখন পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং তা প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নয়; আমার কন্যাকে আপনার গ্রহণ করা উচিত।"

শ্লোক ১৩

য উদ্যতমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে ।
ক্ষীয়তে তদ্‌যশঃ স্ফীতং মানশ্চাবজ্ঞয়া হতঃ ॥ ১৩ ॥

যঃ—যে; **উদ্যতম্**—কাম্য বস্তু; **অনাদৃত্য**—প্রত্যাখ্যান করে; **কীনাশম্**—কৃপণের কাছ থেকে; **অভিযাচতে**—ভিক্ষা করে; **ক্ষীয়তে**—নষ্ট হয়; **তৎ**—তার; **যশঃ**—যশ; **স্ফীতম্**—বিস্তৃত; **মানঃ**—সম্মান; **চ**—এবং; **অবজ্ঞয়া**—অবহেলা করার ফলে; **হতঃ**—বিনষ্ট।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আপনা থেকে আগত কাম্য বস্তুর অনাদর করে, পরে কৃপণের কাছে ভিক্ষা করে, তিনি মহা প্রতিষ্ঠাশালী হলেও তাঁর যশ ক্ষয় হয়, এবং অন্যদের অবজ্ঞা করার জন্য তাঁর সম্মানও বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

বৈদিক বিবাহের প্রথায় সাধারণত পিতা তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের কাছে দান করেন। এইটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিবাহ। পাত্রপক্ষ বিবাহ করার জন্য কন্যার পিতার কাছে গিয়ে কন্যাকে প্রার্থনা করা উচিত নয়। তাতে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় বলে মনে করা হয়। স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনিকে রাজী করাতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে, মুনিবর এক উপযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন—"আমি আপনাকে ঠিক সেই ধরনের এক উপযুক্ত পত্নী দান করছি। এই দান প্রত্যাখ্যান করবেন না, অন্যথায়, যেহেতু আপনি পত্নী গ্রহণে ইচ্ছুক, তাই আপনাকে সেই জন্য অন্য কারও কাছে পত্নী ভিক্ষা করতে হতে পারে, যাঁরা আপনার সঙ্গে এত ভালভাবে আচরণ নাও করতে পারেন। তখন আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।"

এই ঘটনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন সম্রাট, কিন্তু তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর গুণবতী কন্যাকে সম্প্রদান করতে গিয়েছিলেন। কর্দম মুনির কোন জাগতিক সম্পত্তি ছিল না—তিনি ছিলেন একজন বনবাসী তপস্বী—কিন্তু তিনি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাই, কন্যা দানের ব্যাপারে জাগতিক বিষয়-সম্পত্তির থেকে সংস্কৃতি এবং গুণাবলীর গুরুত্ব অধিক।

শ্লোক ১৪

অহং ত্বাশৃণবং বিদ্বন্ বিবাহার্থং সমুদ্যতম্ ।
অতস্ত্বমুপকুর্বাণঃ প্রত্তাং প্রতিগৃহ্যাণ মে ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; **ত্বা**—আপনি; **অশৃণবম্**—শুনেছি; **বিদ্বন্**—হে জ্ঞানবান; **বিবাহ-অর্থম্**—বিবাহ করার জন্য; **সমুদ্যতম্**—প্রস্তুত হয়েছেন; **অতঃ**—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **উপকুর্বাণঃ**—যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করেননি; **প্রত্তাম্**—প্রদান করা হয়েছে; **প্রতিগৃহ্যাণ**—দয়া করে অঙ্গীকার করুন; **মে**—আমার।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু বললেন—হে জ্ঞানবান। আমি শুনেছি যে, আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন। দয়া করে আপনি আমার দ্বারা অর্পিত এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, কেননা আপনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেননি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্যের তত্ত্ব হচ্ছে কৌমার্য। দুই প্রকার ব্রহ্মচারী রয়েছেন—তার একটি হচ্ছে *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী*, যার অর্থ হচ্ছে আজীবন কৌমার্য অবলম্বনের ব্রত গ্রহণ করা, এবং অন্যটি হচ্ছে *উপকুর্বাণ-ব্রহ্মচারী*, অর্থাৎ কোন বিশেষ বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের ব্রত অবলম্বন করা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করতে পারেন, এবং তার পর তাঁর গুরুর অনুমতিক্রমে তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারেন। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে বিদ্যার্থীর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম আশ্রম, এবং ব্রহ্মচর্যের নীতি হচ্ছে কৌমার্য। গৃহস্থই কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগ বা যৌন জীবনে লিপ্ত হতে পারেন, ব্রহ্মচারীর পক্ষে তার অনুমোদন নেই। স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করার জন্য, কেননা কর্দম মুনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত অবলম্বন করেননি। তিনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং এক অতি সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের উপযুক্ত কন্যাকে তাঁর কাছে সম্প্রদান করা হচ্ছিল।

শ্লোক ১৫

ঋষিরুবাচ

বাঢ়মুদ্বোঢ়ুকামোঽহমপ্রত্তা চ তবাত্মজা ।
আবয়োরনুরূপোঽসাবাদ্যো বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ১৫ ॥

ঋষিঃ—মহর্ষি কর্দম; উবাচ—বলেছিলেন; বাঢ়ম্—অতি উত্তম; উদ্বোঢু-কামঃ—বিবাহ করতে ইচ্ছুক; অহম্—আমি; অপ্রত্তা—অন্য কারও কাছে প্রতিশ্রুতা নয়; চ—এবং; তব—আপনার; আত্ম-জা—কন্যা; আবয়োঃ—আমাদের দুই জনের; অনুরূপঃ—উপযুক্ত; অসৌ—এই; আদ্যঃ—প্রথম; বৈবাহিকঃ—বিবাহের; বিধিঃ—অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

মহর্ষি উত্তর দিলেন, আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সেই কথা সত্য। আপনার কন্যাও অন্য কারও কাছে প্রতিশ্রুতা নয় কিংবা বিবাহিতা নয়। অতএব বৈদিক বিধি অনুসারে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাকে গ্রহণ করার পূর্বে অনেক কিছু বিবেচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল যে, দেবহূতি প্রথমে তাঁকেই বিবাহ করতে সংকল্প করেছিলেন। তিনি অন্য কোনও পুরুষকে তাঁর পতিরূপে বরণ করতে মনস্থ করেননি। এইটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় ছিল, কেননা রমণীদের মনোভাব হচ্ছে এমনই যে, প্রথম যে-পুরুষকে তাঁরা তাঁদের হৃদয় অর্পণ করেন, তা ফিরিয়ে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়। আর তা ছাড়া, তিনি ছিলেন অবিবাহিতা; তিনি কুমারী ছিলেন। এই সমস্ত বিচার করে, কর্দম মুনি তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহের ধর্মনীতি অনুসারে গ্রহণ করব।" বিভিন্ন প্রকার বিবাহ রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে উপযুক্ত পাত্রকে নিমন্ত্রণ করে এনে, তাঁর হস্তে বস্ত্র এবং অলঙ্কারে বিভূষিতা কন্যাকে পিতার সামর্থ্য অনুসারে যৌতুক সহ দান করা। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রকার বিবাহ রয়েছে, যেমন গান্ধর্ব বিবাহ বা পরস্পরের প্রতি প্রেম-পরায়ণ হয়ে নিজে নিজে বিবাহ করা, এই বিবাহও স্বীকৃত। এমন কি কন্যাকে যদি বলপূর্বক হরণ করার পর পত্নীরূপে

গ্রহণ করা হয়, সেইটিও স্বীকৃত। কিন্তু কর্দম মুনি যেভাবে বিবাহ করেছিলেন তা হচ্ছে সর্বোত্তম, কেননা তাতে পিতার সম্মতি ছিল এবং কন্যাও ছিলেন উপযুক্ত। তিনি পূর্বে অন্য কাউকে তাঁর হৃদয় অর্পণ করেননি। এই সমস্ত বিবেচনা করার পর, কর্দম মুনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ
পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত
স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

কামঃ—বাসনা; **সঃ**—তা; **ভূয়াৎ**—তা পূর্ণ হোক; **নর-দেব**—হে রাজন্; **তে**—আপনার; **অস্যাঃ**—এই; **পুত্র্যাঃ**—কন্যার; **সমাম্নায়-বিধৌ**—বৈদিক শাস্ত্র-বিধি অনুসারে; **প্রতীতঃ**—অনুমোদিত; **কঃ**—কে; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **তে**—আপনার; **তনয়াম্**—কন্যাকে; **ন আদ্রিয়েত**—আদর না করবেন; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **এব**—কেবল; **কান্ত্যা**—অঙ্গকান্তি; **ক্ষিপতীম্**—তিরস্কার করে; **ইব**—যেন; **শ্রিয়ম্**—অলঙ্কার সমূহ।

অনুবাদ

আপনার কন্যার বিবাহের বাসনা, যা বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, তা পূর্ণ হোক। তিনি এতই সুন্দরী যে, তাঁর অঙ্গকান্তির দ্বারা তাঁর অলঙ্কারেরও শোভা তিরস্কৃত হয়, সুতরাং কোন্ পুরুষ সমাদরপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ না করবে?

তাৎপর্য

কর্দম মুনি দেবহূতিকে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। বৈদিক শাস্ত্র-বিধি অনুসারে সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে, বরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করে এনে, প্রয়োজনীয় অলঙ্কার, স্বর্ণ, আসবাবপত্র এবং গৃহস্থালির অন্যান্য সামগ্রী সহ কন্যাকে তাঁর হস্তে সম্প্রদান করা। বিবাহের এই প্রথা আজও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, এবং শাস্ত্রে বলা হয় যে, তার ফলে কন্যার পিতার প্রভূত পুণ্য অর্জন হয়। উপযুক্ত জামাতার হস্তে কন্যাকে দান করা গৃহস্থের পক্ষে অন্যতম পুণ্য কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। *মনুস্মৃতিতে* আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করা

হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল ব্রাহ্ম বা রাজসিক—এই একটি বিবাহই বর্তমানে প্রচলিত। অন্যান্য বিবাহ—ভালবেসে, মালা বদল করে অথবা বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করে বিবাহ—এই কলিযুগে নিষিদ্ধ। পূর্বে, ক্ষত্রিয়েরা সানন্দে অন্য কোন রাজপরিবারের রাজকন্যাকে হরণ করতেন, এবং তার ফলে সেই ক্ষত্রিয় এবং কন্যার পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ হত; সেই যুদ্ধে যদি অপহরণকারী জয়ী হতেন, তা হলে সেই কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হত। শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে রুক্মিণীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁর কয়েকজন পুত্র এবং পৌত্রেরাও এইভাবে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র দুর্যোধনের কন্যাকে হরণ করেছিলেন, যার ফলে কুরু এবং যদু বংশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। অবশেষে, কুরুবংশের প্রবীণ সদস্যেরা তার মীমাংসা করেছিলেন। পুরাকালে এই প্রকার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে তা অসম্ভব কেননা ক্ষত্রিয়-জীবনের অতি উন্নত আদর্শ আজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু ভারতবর্ষ বিদেশীদের অধীন হয়ে গেছে, তাই তার সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাবও নষ্ট হয়ে গেছে ; এখন, শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সকলেই হচ্ছে শূদ্র। তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা তাদের ঐতিহ্যগত আচরণের কথা ভুলে গেছে, এবং সেই আচরণের অনুপস্থিতিতে তারা সকলে শূদ্রে পরিণত হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *কলৌ শূদ্রসম্ভবঃ*। কলিযুগে সকলেই শূদ্রের মতো হয়ে যাবে। ঐতিহ্যপূর্ণ সামাজিক প্রথাগুলি এই যুগে আর অনুশীলন করা হয় না, যদিও পূর্বে সেইগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হত।

শ্লোক ১৭

যাং হর্ম্যপৃষ্ঠে ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং
বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীম্ ।
বিশ্বাবসুর্ন্যপতৎস্বাদ্বিমানা-
দ্বিলোক্য সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ ॥ ১৭ ॥

যাম্—যাঁকে; হর্ম্য-পৃষ্ঠে—প্রাসাদের ছাদে; ক্বণৎ-অঙ্ঘ্রি-শোভাম্—পায়ের নূপুরের শব্দে যে আরও সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল; বিক্রীড়তীম্—খেলা করছিল; কন্দুক-বিহ্বল-অক্ষীম্—কন্দুকের প্রতি নিবদ্ধ চঞ্চল আঁখি; বিশ্বাবসুঃ—বিশ্বাবসু; ন্যপতৎ—পতিত হয়েছিল; স্বাৎ—তাঁর; বিমানাৎ—বিমান থেকে; বিলোকা—দর্শন করে; সম্মোহ-বিমূঢ়-চেতাঃ—সম্মোহবশত বিমূঢ় চিত্ত।

অনুবাদ

আমি শুনেছি যে, আপনার কন্যা যখন প্রাসাদের ছাদের উপর কন্দুক নিয়ে খেলা করছিল, তখন তাঁর পায়ের নূপুরের শব্দে তাঁর সৌন্দর্য আরও অধিক শোভাযুক্ত হয়েছিল এবং কন্দুকের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল হয়েছিল, তখন বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব তাঁকে দর্শন করে, সম্মোহবশত বিমূঢ় চিত্ত হয়ে তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কেবল বর্তমান সময়েই নয়, তখনকার দিনেও গগনচুম্বী প্রাসাদ ছিল। এখানে আমরা *হর্ম্যপৃষ্ঠে* শব্দটি পেয়েছি। *হর্ম্য* মানে হচ্ছে বিশাল প্রাসাদ। *স্বাচ্ছিমানাৎ* মানে 'তাঁর নিজের বিমান থেকে'। তা থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার দিনেও ব্যক্তিগত বিমান বা হেলিকপ্টার ছিল। গন্ধর্ব বিশ্বাবসু যখন গগন-মার্গে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি প্রাসাদের ছাদে দেবহূতিকে একটি কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেন। তখনকার দিনে কন্দুক নিয়ে খেলা করার প্রচলনও ছিল, তবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা সার্বজনীন স্থানে খেলতেন না। কন্দুক নিয়ে খেলা এবং এই ধরনের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ সাধারণ স্ত্রী অথবা বালিকাদের জন্য ছিল না, কেবল দেবহূতির মতো রাজকন্যারাই এই ধরনের খেলা খেলতে পারতেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁকে উড়ন্ত বিমান থেকে দেখা গিয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাসাদটি ছিল অত্যন্ত উচ্চ, তা না হলে কিভাবে বিমান থেকে তাঁকে দেখা গিয়েছিল? এই দৃশ্য এতই স্পষ্ট ছিল যে, গন্ধর্ব বিশ্বাবসু তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করে এবং তাঁর পায়ের নূপুরের শব্দ শুনে এতই মোহিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। কর্দম মুনি যেভাবে তা শুনেছিলেন, সেইভাবে তার বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললাম-
মসেবিতশ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্ ।
বৎসাং মনোরুচ্চপদঃ স্বসারং
কো নানুগন্যেত বুধোঽভিযাতাম্ ॥ ১৮ ॥

তাম্—তাঁর; প্রার্থয়ন্তীম্—অন্বেষণ করে; ললনা-ললামম্—রমণীকুলের ভূষণ-স্বরূপ; অসেবিত-শ্রী-চরণৈঃ—যারা কখনও লক্ষ্মীদেবীর শ্রীচরণের সেবা করেনি; অদৃষ্টাম্—দর্শনের অযোগ্য; বৎসাম্—প্রিয় কন্যা; মনোঃ—স্বায়ম্ভুব মনুর; উচ্চপদঃ—উত্তানপাদের; স্বসারম্—ভগিনী; কঃ—কি; ন অনুমন্যেত—স্বাগত জানাবে না; বুধঃ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; অভিযাতাম্—স্বেচ্ছায় যিনি আগমন করেছেন।

অনুবাদ

রমণীকুলের ভূষণ-স্বরূপ, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং উত্তানপাদের ভগিনী এই কন্যাটিকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাদরে গ্রহণ করবে না? যারা লক্ষ্মীদেবীর চরণ-কমলের সেবা করেনি, তারা এঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না, অথচ ইনি স্বেচ্ছায় আমাকে পতিরূপে বরণ করার জন্য এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি বিভিন্নভাবে দেবহূতির সৌন্দর্য এবং যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন। দেবহূতি বাস্তবিকই ছিলেন রত্ন আভরণে বিভূষিতা সমস্ত রমণীর ভূষণ-স্বরূপ। অলঙ্কার পরে মেয়েরা সুন্দর হয়, কিন্তু দেবহূতি ছিলেন সমস্ত অলঙ্কারের থেকেও সুন্দর; তাঁকে সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিতা সুন্দরী রমণীদের ভূষণ-স্বরূপ বিবেচনা করা হয়েছিল। দেবতা এবং গন্ধর্বেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কর্দম মুনি যদিও ছিলেন একজন মহর্ষি, তবুও তিনি স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন না, কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্গ থেকে আগত বিশ্বাবসুও দেবহূতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর দেহের সৌন্দর্য ছাড়াও তিনি ছিলেন সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং মহারাজ উত্তানপাদের ভগিনী। এই প্রকার কন্যাকে কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

শ্লোক ১৯

অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং
যাবত্তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে ।
অতো ধর্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্
শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্ ॥ ১৯ ॥

অতঃ—অতএব; ভজিষ্যে—আমি গ্রহণ করব; সময়েন—শর্ত সহ; সাধ্বীম্—সাধ্বী কন্যা; যাবৎ—যে পর্যন্ত ; তেজঃ—বীর্য; বিভৃয়াৎ—ধারণ করে; আত্মনঃ—আমার শরীর থেকে; মে—আমার; অতঃ—তার পর; ধর্মান্—কর্তব্য; পারমহংস্য-মুখ্যান্—

পরমহংসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **শুক্ল-প্রোক্তান্**—শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক কথিত; **বহু**—অধিক; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **অবিহিংস্রান্**—হিংসাশূন্য।

অনুবাদ

অতএব এই সাধ্বী কন্যাকে আমি একটি শর্তে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করব—যতদিন পর্যন্ত না তিনি আমার বীর্য ধারণ করেন, ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর ভজনা করব, এবং তার পর পরমহংসেরা ভগবদ্ভক্তির যে-পন্থা অবলম্বন করেন, আমি সেই জীবন গ্রহণ করব। সেই পন্থা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বর্ণনা করেছিলেন, এবং তা হিংসা-রহিত।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কাছে অত্যন্ত সুন্দরী পত্নীর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং তিনি সম্রাটের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে স্বীকার করেছিলেন। কর্দম মুনি তাঁর আশ্রমে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করছিলেন, এবং যদিও তাঁর বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল, তবুও তিনি সারা জীবন গৃহস্থ হয়ে থাকতে চাননি, কেননা তিনি মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, জীবনের প্রথম ভাগ চরিত্র তথা গুণের বিকাশের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য পালন করার মাধ্যমে উপযোগ করা উচিত। জীবনের পরবর্তী অংশে কোন ব্যক্তি গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করার মাধ্যমে, পত্নীর পাণিগ্রহণ করতে পারেন এবং সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, কিন্তু তা বলে কুকুর-বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়।

কর্দম মুনি এমনই এক সন্তান কামনা করেছিলেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের একটি কিরণ হবে। মানুষের কর্তব্য এমন সন্তান উৎপাদন করা, যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করতে পারে, তা না হলে সন্তান উৎপাদনের কোন প্রয়োজন নেই। উত্তম পিতা দুই প্রকার সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন—এক হচ্ছেন তিনি, যিনি কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে, সেই জন্মেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, এবং অন্যটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের কিরণ, যিনি সারা বিশ্বে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে পারেন। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে, কিভাবে কর্দম মুনি জন্ম দান করেছিলেন সেই রকম এক পুত্র—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার কপিল মুনিকে, যিনি সাংখ্য দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন। মহান গৃহস্থেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, যাতে মানব-সমাজে এক কল্যাণকারী আন্দোলনের সৃষ্টি হতে পারে। সেইটি সন্তান

উৎপাদনের একটি কারণ। অন্য কারণটি হচ্ছে, অতি উন্নত তত্ত্বদর্শী পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন, যাতে তাঁদের সেই সন্তানটিকে দুঃখ-দুর্দশাময় এই জগতে আর ফিরে আসতে না হয়। পিতা-মাতাদের তাঁদের সন্তানদের প্রতি একটি কর্তব্য রয়েছে, এবং তা হচ্ছে তাদের যেন পুনরায় মাতৃজঠরে প্রবেশ করতে না হয়। এই জীবনে যদি শিশুকে মুক্তির শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে বিবাহ করার অথবা সন্তান উৎপাদন করার কোন প্রয়োজন নেই। মানব-সমাজ যদি সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাত সৃষ্টি করার জন্য কুকুর এবং বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে, তা হলে এই পৃথিবী নরকে পরিণত হবে, যা এই কলিযুগে ইতিমধ্যেই হয়েছে। এই যুগে, মাতা-পিতা এবং সন্তান-সন্ততি কেউই শিক্ষিত নয়; তারা উভয়েই পশুবৎ, এবং আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজ-জীবনে এই বিশৃঙ্খলা কখনও মানব-সমাজে শান্তি আনতে পারে না। কর্দম মুনি পূর্বে বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনি দেবহূতির সঙ্গে সারা জীবন সঙ্গ করবেন না। তিনি কেবল তাঁর সন্তান লাভ করা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যৌন জীবন কেবল সুসন্তান উৎপাদনের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। মানব-জীবন বিশেষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, পূর্ণ ভক্তি লাভ করার জন্য। সেইটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন।

উত্তম সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব সম্পাদন করার পর, মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত এবং পরমহংস স্তরের সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করা উচিত। পরমহংস বলতে বোঝায় জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি স্তর রয়েছে, এবং তার মধ্যে পরমহংস স্তরটি হচ্ছে সর্বোচ্চ। শ্রীমদ্ভাগবতকে বলা হয় পরমহংস সংহিতা, অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের মানুষদের জন্য রচিত গ্রন্থ। পরমহংসেরা নির্মৎসর। জীবনের অন্যান্য স্তরে, এমন কি গৃহস্থ আশ্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মৎসরতা রয়েছে, কিন্তু পরমহংস স্তরে মানুষ যেহেতু সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন, অথবা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তাই সেই স্তরে মৎসরতার কোন অবকাশ নেই। প্রায় একশ বছর আগে, কর্দম মুনির মতো ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এমন একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন, যিনি পূর্ণ মাত্রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন এবং শিক্ষা প্রচার করতে পারবেন। ভগবানের কাছে তাঁর এই প্রার্থনার ফলে, তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে তাঁর পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, যিনি আজ তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মাধ্যমে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন প্রচার করছেন।

শ্লোক ২০

যতোঽভবদ্বিশ্বমিদং বিচিত্রং
সংস্থাস্যতে যত্র চ বাবতিষ্ঠতে ।
প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহ্যং
পরং প্রমাণং ভগবানননন্তঃ ॥ ২০ ॥

যতঃ—যাঁর থেকে; **অভবৎ**—প্রকট হয়েছে; **বিশ্বম্**—সৃষ্টি; **ইদম্**—এই; **বিচিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **সংস্থাস্যতে**—বিলীন হয়ে যাবে; **যত্র**—যাতে; **চ**—এবং; **বা**—অথবা; **অবতিষ্ঠতে**—বর্তমানে অবস্থান করছে; **প্রজা-পতীনাম্**—প্রজাপতিদের; **পতিঃ**—ঈশ্বর; **এষঃ**—এই; **মহ্যম্**—আমাকে; **পরম্**—সর্বোচ্চ; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অসীম।

অনুবাদ

যাঁর থেকে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, যিনি তা পালন করছেন এবং অন্তে যাঁর মধ্যে তা লীন হয়ে যাবে, সেই অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান আমার পরম প্রভু। তিনি এই জগতে জীবেদের জন্মদানকারী প্রজাপতিদেরও উৎস।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁর পিতা প্রজাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। সৃষ্টির আদিতে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকগুলিতে বসবাস করার জন্য প্রজা সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল প্রজাপতিদের। কিন্তু কর্দম মুনি বলছেন যে, যদিও তাঁর পিতা ছিলেন প্রজাপতি, যিনি তাঁকে সন্তান উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরও উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কেননা শ্রীবিষ্ণু সব কিছুরই উৎস; এবং তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্রষ্টা, প্রকৃত পালনকর্তা এবং বিনাশের পর সব কিছু তাঁর মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে। এটিই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি-কার্য, পালন-কার্য এবং বিনাশ-কার্যের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব) রয়েছেন, কিন্তু ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর হচ্ছেন বিষ্ণুরই গুণাবতার। বিষ্ণু হচ্ছেন প্রধান পুরুষ। তাই, বিষ্ণু পালন-কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছাড়া আর কেউই সমগ্র সৃষ্টি পালন করতে পারেন না। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তাদের অনন্ত চাহিদাও রয়েছে, এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ অসংখ্য জীবের এই অনন্ত চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে না। ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার এবং শিবকে ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মাঝখানের কার্য, পালন করার দায়িত্বটি বিষ্ণু স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। কর্দম

মুনি তাঁর অতি উন্নত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে ভালভাবেই জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন তাঁর আরাধ্য দেব। বিষ্ণুর বাসনাই ছিল তাঁর কর্তব্য, এবং তা ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন না। তিনি বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করতে চাননি। তিনি কেবল একটিই সন্তান উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন, যিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবেন। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় বা ধর্মীয় সংকট দেখা দেয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবতরণ করে ধার্মিকদের রক্ষা করেন এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করেন।

বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করা পূর্বপুরুষদের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার একটি উপায় বলে বিবেচনা করা হয়। শিশুর জন্মের পরেই বহুভাবে তাকে ঋণী হতে হয়। সেইগুলি হচ্ছে পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণ, দেবতাদের কাছে ঋণ, পিতৃদের কাছে ঋণ, ঋষিদের কাছে ঋণ ইত্যাদি। কিন্তু কেউ যদি পরমারাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে অন্য ঋণগুলি শোধ করার চেষ্টা না করা সত্ত্বেও, তিনি সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। কর্দম মুনি চেয়েছিলেন পরমহংস জ্ঞান লাভ করে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে, এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবল একটি সন্তান উৎপাদন করতে, ব্রহ্মাণ্ডের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য তিনি অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করতে চাননি।

শ্লোক ২১

মৈত্রেয় উবাচ
স উগ্রধন্বন্নিয়দেবাবভাষে
আসীচ্চ তূষ্ণীমরবিন্দনাভম্ ।
ধিয়োপগৃহ্ণন্ স্মিতশোভিতেন
মুখেন চেতো লুলুভে দেবহূত্যাঃ ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **সঃ**—তিনি (কর্দম); **উগ্র-ধন্বন্**—হে মহান যোদ্ধা বিদুর; **ইয়ৎ**—এই পর্যন্ত; **এব**—কেবল; **আবভাষে**—বলেছিলেন; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **চ**—এবং; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **অরবিন্দ-নাভম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু (যাঁর নাভি কমল দ্বারা ভূষিত); **ধিয়া**—চিন্তার দ্বারা; **উপগৃহ্ণন্**—অধিকার করে;

স্মিত-শোভিতেন—তাঁর হাসির দ্বারা শোভিত; মুখেন—তাঁর মুখের দ্বারা; চেতঃ—মন; লুলুভে—মোহিত হয়েছিল; দেবহূত্যাঃ—দেবহূতির।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে মহান যোদ্ধা বিদুর! মহর্ষি কর্দম কেবল এই পর্যন্ত বলেই তাঁর আরাধ্য অরবিন্দনাভ ভগবান বিষ্ণুর চিন্তা করে মৌন হলেন। তাঁর স্মিত হাস্যের দ্বারা শোভিত মুখমণ্ডল তখন দেবহূতির মন হরণ করেছিল, এবং তিনি তখন সেই মহর্ষির ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কর্দম মুনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন, কেননা মৌন হওয়া মাত্রই তিনি শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পন্থা। শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ-চিন্তায় এতই মগ্ন থাকেন যে, তাঁরা অন্য কিছু চিন্তা করছেন অথবা অন্যভাবে কর্ম করছেন বলে মনে হলেও, তাঁদের কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর অন্য কিছু করণীয় নেই। তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের কথাই কেবল চিন্তা করেন। এই প্রকার কৃষ্ণভক্তের হাসি এতই আকর্ষণীয় যে, তিনি কেবল তাঁর হাসির দ্বারা বহু গুণগ্রাহী, শিষ্য এবং অনুগামীদের হৃদয় জয় করে নেন।

শ্লোক ২২

সোঽনুজ্ঞাত্বা ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ স্ফুটম্ ।
তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহর্ষিতঃ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি (সম্রাট মনু); অনু—পরে; জ্ঞাত্বা—জেনে; ব্যবসিতম্—দৃঢ় সংকল্প; মহিষ্যাঃ—রানীর; দুহিতুঃ—তাঁর কন্যার; স্ফুটম্—স্পষ্টরূপে; তস্মৈ—তাঁকে; গুণ-গণ-আঢ্যায়—বহু গুণসম্পন্ন; দদৌ—সম্প্রদান করেছিলেন; তুল্যাম্—(সদ্‌গুণাবলীতে) সমতুলা; প্রহর্ষিতঃ—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

সম্রাট তাঁর মহিষী এবং তাঁর কন্যার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হয়ে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহু গুণান্বিত সেই মুনিকে তাঁর উপযুক্ত কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্মহাধনান্ ।
দম্পত্যোঃ পর্যদাৎপ্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্ ॥ ২৩ ॥

শতরূপা—সম্রাজ্ঞী শতরূপা; **মহা-রাজ্ঞী**—মহারানী; **পারিবর্হান্**—যৌতুক; **মহা-ধনান্**—বহু মূল্যবান উপহার; **দম্-পত্যোঃ**—বর-বধূকে; **পর্যদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **প্রীত্যা**—প্রীতিভরে; **ভূষা**—অলঙ্কার; **বাসঃ**—বসন; **পরিচ্ছদান্**—গৃহের উপকরণ সমূহ।

অনুবাদ

মহারানী শতরূপা প্রীতিভরে বহুমূল্য অলঙ্কার, বসন এবং গৃহের বিবিধ উপকরণ যৌতুক-স্বরূপ দম্পতিকে প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

যৌতুক সহ কন্যাদের সম্প্রদান করার প্রথা আজও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। উপহার সমূহ দেওয়া হয় কন্যার পিতার অবস্থা অনুসারে। *পারিবর্হান্ মহাধনান্* মানে হচ্ছে বিবাহের সময় বরকে যে যৌতুক দান করা অবশ্য কর্তব্য। এখানে *মহাধনান্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্রাজ্ঞীর যৌতুকের উপযুক্ত মহা মূল্যবান উপহার সমূহ। এখানে *ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্* শব্দগুলির প্রয়োগ হয়েছে। *ভূষা* মানে 'অলঙ্কার', *বাসঃ* মানে 'বসন', এবং *পরিচ্ছদান্* মানে 'গৃহের বিবিধ উপকরণ'। সম্রাটের কন্যার বিবাহের উপযুক্ত সব কিছু কর্দম মুনিকে দান করা হয়েছিল, যিনি তখনও পর্যন্ত ব্রতধারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। কন্যা দেবহূতি অত্যন্ত মূল্যবান অলঙ্কার এবং বেশভূষায় সজ্জিতা ছিলেন।

এইভাবে পূর্ণ ঐশ্বর্য সহকারে গুণান্বিতা পত্নীর সঙ্গে কর্দম মুনির বিবাহ হয়েছিল, এবং গৃহস্থালির সমস্ত আবশ্যকীয় উপকরণগুলি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৈদিক প্রথায় কন্যার পিতা জামাতাকে আজও এইভাবে যৌতুক দিয়ে থাকেন; এমন কি ভারতবর্ষে দরিদ্র পরিবারও বিবাহে যৌতুক-স্বরূপ শত-সহস্র টাকা ব্যয় করে। যৌতুক দেওয়ার প্রথা অবৈধ নয়, যা অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যৌতুক হচ্ছে পিতার সদিচ্ছার প্রতীক-স্বরূপ কন্যাকে প্রদত্ত দান, যা অনিবার্য। পিতা যদি যৌতুক দানে সম্পূর্ণ অক্ষমও হয়, তা হলেও অন্তত কিছু ফল এবং ফুল দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফল এবং ফুল দান করলে

ভগবানও প্রসন্ন হন। আর্থিক অক্ষমতার জন্য যৌতুক না দিতে পারলে, অন্য কোন উপায়ে যৌতুক সংগ্রহ করার প্রশ্ন ওঠে না, তখন জামাতার প্রসন্নতার জন্য তাঁকে ফল এবং ফুল দেওয়া যেতে পারে।

শ্লোক ২৪

প্রত্তাং দুহিতরং সম্রাট্ সদৃক্ষায় গতব্যথঃ ।
উপগুহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রত্তাম্—দান করে; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **সম্রাট্**—সম্রাট (মনু); **সদৃক্ষায়**—উপযুক্ত পাত্রে; **গত-ব্যথঃ**—তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **চ**—এবং; **বাহুভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহুর দ্বারা; **ঔৎকণ্ঠ্য-উন্মথিত-আশয়ঃ**—উৎকণ্ঠা এবং ক্ষুব্ধ মন।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন তখন বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়েছিল এবং তখন তিনি স্নেহভরে তাঁর দুই বাহুর দ্বারা তাঁর কন্যাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতা তাঁর বয়স্থা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ না দেওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার উপর কন্যার দায়িত্ব থাকে; এবং যখন পিতা সেই দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হন, তখন তিনি স্বস্তি অনুভব করেন।

শ্লোক ২৫

অশক্নুবংস্তদ্বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ ।
আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ ॥ ২৫ ॥

অশক্নুবন্—সহ্য করতে অক্ষম হয়ে; **তৎ-বিরহম্**—তাঁর বিচ্ছেদ; **মুঞ্চন্**—বর্ষণ করে; **বাষ্প-কলাম্**—অশ্রু; **মুহুঃ**—বার বার; **আসিঞ্চৎ**—সিক্ত করেছিলেন; **অম্ব**—হে মাতঃ; **বৎস**—হে বৎসে; **ইতি**—এইভাবে; **নেত্র-উদৈঃ**—চোখের জলে; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **শিখাঃ**—কেশদাম।

অনুবাদ

কন্যার বিরহ সহ্য করতে না পেরে, সম্রাট "হে মাত। হে বৎসে।" এইভাবে সম্বোধন করতে করতে অশ্রুজলে তাঁর কন্যার মস্তক সিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অম্ব শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পিতা কখনও কখনও স্নেহবশত কন্যাকে মাতা বলে সম্বোধন করেন এবং কখনও কখনও 'প্রিয়তমা' বলে সম্বোধন করেন। বিরহ বেদনার অনুভূতি হয় কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না কন্যার বিবাহ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পিতার কন্যারূপে গৃহে থাকে, কিন্তু বিবাহের পর আর তাকে পরিবারের কন্যা বলে দাবি করা যায় না; তাকে পতিগৃহে গমন করতে হয়, কেননা বিবাহের পর সে তার পতির সম্পত্তি হয়ে যায়। মনুসংহিতা অনুসারে, নারী কখনও স্বতন্ত্র নয়। তার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে তার পিতার সম্পত্তি, বিবাহের পর তার নিজের সন্তান উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং বার্ধক্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সে তার পতির সম্পত্তি। বৃদ্ধ বয়সে, পতি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের সম্পত্তিরূপে অবস্থান করেন। নারী সর্বদাই পিতা, পতি অথবা উপযুক্ত পুত্রের উপর নির্ভরশীল থাকেন। দেবহূতির জীবনে তা প্রদর্শিত হবে। দেবহূতির পিতা তাঁর দায়িত্ব তাঁর পতি কর্দম মুনির হস্তে অর্পণ করেছিলেন, এবং কর্দম মুনি যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি সেই দায়িত্ব তাঁর পুত্র কপিলদেবের উপর অর্পণ করেন। সেই ঘটনাগুলি ক্রমশ বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২৬-২৭

আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজ্ঞাতঃ সহানুগঃ ।
প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্যঃ স্বপুরং নৃপঃ ॥ ২৬ ॥
উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ ।
ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ ॥ ২৭ ॥

আমন্ত্র্য—যাওয়ার অনুমতি নিয়ে; **তম্**—তাঁর (কর্দম) থেকে; **মুনি-বরম্**—মুনিশ্রেষ্ঠ; **অনুজ্ঞাতঃ**—প্রস্থান করার অনুমতি পেয়ে; **সহ-অনুগঃ**—তাঁর অনুগামীগণ সহ; **প্রতস্থে**—প্রস্থান করলেন; **রথম্ আরুহ্য**—রথে আরোহণ করে; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **স্ব-পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে; **নৃপঃ**—সম্রাট; **উভয়োঃ**—দুই জনের উপর; **ঋষি-কুল্যায়াঃ**—ঋষিকুলের হিতসাধিনী; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **সু-রোধসোঃ**

—সুন্দর তটে; ঋষীনাম্—মহান ঋষিদের; উপশান্তানাম্—প্রশান্ত; পশ্যন্—দর্শন করে; আশ্রম-সম্পদঃ—আশ্রমসমূহের শোভা-সম্পদ।

অনুবাদ

মহর্ষির অনুমতি নিয়ে সম্রাট তাঁর পত্নী সহ রথে আরোহণ করে, তাঁর অনুগামীগণ সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি ঋষিদের হিতসাধিনী সরস্বতী নদীর উভয় তটে প্রশান্ত ঋষিদের আশ্রমের শোভা-সম্পদ দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগে যেমন প্রভূত যন্ত্রবিদ্যা এবং স্থাপত্য শিল্পের দক্ষতা সহকারে শহরগুলি তৈরি হয়, তেমনই প্রাচীন কালে ঋষিকুল নামক জনপদ ছিল, যেখানে মহাত্মারা বাস করতেন। ভারতবর্ষে এখনও পরমার্থ উপলব্ধির অপূর্ব সুন্দর অনেক স্থান রয়েছে; ঋষি এবং মহাত্মারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য গঙ্গা এবং যমুনার তীরে সুন্দর কুটীরে বাস করেন। অনুগামীগণ সহ রাজা যখন ঋষিকুলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা সেখানকার কুটির এবং আশ্রমের সৌন্দর্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ* । মহান ঋষিদের গগনচুম্বী প্রাসাদ ছিল না, কিন্তু তাঁদের আশ্রম এতই সুন্দর ছিল যে, তা দেখে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্তাৎপ্রজাঃ পতিম্ ।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; আয়ান্তম্—আগত; অভিপ্রেত্য—জেনে; ব্রহ্মাবর্তাৎ—ব্রহ্মাবর্ত থেকে; প্রজাঃ—তাঁর প্রজারা; পতিম্—তাদের প্রভু; গীত-সংস্তুতি-বাদিত্রৈঃ—সংগীত, স্তব এবং বাদ্য; প্রত্যুদীয়ুঃ—স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন; প্রহর্ষিতাঃ—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে, ব্রহ্মাবর্ত থেকে তাঁর প্রজারা তাঁদের প্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য সংগীত, বাদ্য এবং স্তুতি সহকারে এগিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যখন ভ্রমণান্তে ফিরে আসেন, তখন রাজধানীর নাগরিকেরা প্রথা অনুসারে রাজাকে অভিনন্দন জানান। শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখনও তাঁকে এইভাবে সংবর্ধনা করার বর্ণনা রয়েছে। সমস্ত বর্ণের মানুষেরা তখন পুরদ্বারে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পূর্বে রাজধানীগুলি প্রাচীর বেষ্টিত থাকত এবং নগরে প্রবেশের বিভিন্ন দ্বার থাকত। এমন কি আজও দিল্লীতে বহু পুরাতন দ্বার দেখতে পাওয়া যায়, এবং প্রাচীন শহরগুলিতে সেই রকম দ্বার ছিল যেখানে নাগরিকেরা সমবেত হয়ে রাজাকে স্বাগত জানাত। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, স্বায়ম্ভুব মনুর রাজা ব্রহ্মাবর্তের রাজধানী বর্হিষ্মতীর নাগরিকেরা সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, সম্রাটকে সংগীত, বাদ্য এবং স্তব করার মাধ্যমে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্বসম্পৎসমন্বিতা ।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ ॥ ২৯ ॥
কুশাঃ কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চসঃ ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে ॥ ৩০ ॥

বর্হিষ্মতী—বর্হিষ্মতী; **নাম**—নামক; **পুরী**—নগরী; **সর্ব-সম্পৎ**—সর্ব প্রকার ঐশ্বর্য; **সমন্বিতা**—পূর্ণ; **ন্যপতন্**—পতিত হয়েছিল; **যত্র**—যেখানে; **রোমাণি**—কেশ; **যজ্ঞস্য**—বরাহদেবের; **অঙ্গম্**—তাঁর শরীরের; **বিধুন্বতঃ**—কম্পিত; **কুশাঃ**—কুশ ঘাস; **কাশাঃ**—কাশ ঘাস; **তে**—তারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **আসন্**—হয়েছিল; **শশ্বৎ-হরিত**—চির হরিতের; **বর্চসঃ**—বর্ণ-সমন্বিত; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **পরাভাব্য**—পরাভূত করে; **যজ্ঞ-ঘ্নান্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী; **যজ্ঞম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ঈজিরে**—তাঁরা আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

সর্ব সম্পদ-সমন্বিত বর্হিষ্মতী নগরী এই নাম প্রাপ্ত হয়েছিল কেননা ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বরাহরূপে প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়। তিনি যখন দেহ কম্পন করেছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়ে, চির হরিৎ কুশ এবং কাশ ঘাসে রূপান্তরিত হয়, যার দ্বারা ঋষিরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের পরাভূত করার পর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যে স্থান প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত তাকে বলা হয় পীঠস্থান। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজধানী বর্হিষ্মতী কেবল অতুল ঐশ্বর্য এবং সম্পদশালী হওয়ার জন্যই মহিমান্বিত ছিল না, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবরাহদেবের রোম এখানে পতিত হয়েছিল বলে তা মহিমান্বিত ছিল। ভগবানের সেই রোমরাজি সবুজ ঘাসে পরিণত হয় এবং হিরণ্যাক্ষকে বধ করার পর, তাঁরা ভগবানকে সেই ঘাস দিয়ে আরাধনা করেছিলেন। যজ্ঞ মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, *যজ্ঞার্থকর্ম* —"বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবল সম্পাদিত কর্ম।" ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যখন কিছু করা হয়, সেই কর্ম কর্মকর্তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে। কেউ যদি কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই শ্রীবিষ্ণু বা যজ্ঞের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু করতে হবে। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজধানী বর্হিষ্মতী নগরীতে, মহান ঋষিগণ এবং মহাত্মাগণ সেই বিশেষ কর্মেরই অনুষ্ঠান করতেন।

শ্লোক ৩১

কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য ভগবান্মনুঃ ।
অযজদ্‌যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্ ॥ ৩১ ॥

কুশ—কুশ ঘাসের; **কাশ**—এবং কাশ ঘাসের; **ময়ম্**—নির্মিত; **বর্হিঃ**—আসন; **আস্তীর্য**—বিস্তার করে; **ভগবান্**—মহা ভাগ্যবান; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—ভগবান বিষ্ণুর; **লব্ধা**—লাভ করেছিলেন; **স্থানম্**—আবাস; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **ভুবম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

যাঁর কৃপায় মনু এই ভূমণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন, কুশ এবং কাশ নির্মিত আসন বিছিয়ে তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

মনু হচ্ছেন মানব-জাতির পিতা, এবং তাই মনু থেকে ইংরেজী শব্দ ম্যান অথবা সংস্কৃত মনুষ্য শব্দটি এসেছে। এই জগতে যাঁরা প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করে উচ্চ পদে আসীন রয়েছেন, তাঁদের বিশেষ করে মনুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করা উচিত, যিনি তাঁর রাজ্য এবং ঐশ্বর্যকে পরমেশ্বর ভগবানের দান বলে মনে করে সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। তেমনই, মনুর বংশধর বা মানুষেরা, যাঁরা বিশেষভাবে সমৃদ্ধিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের উপহার। সেই ধন-সম্পদ পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা উচিত। সেটিই সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করার উপায়। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই ঐশ্বর্য, উচ্চ কুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য অথবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই, যাঁরা এই সমস্ত মূল্যবান সুযোগ-সুবিধাগুলি পেয়েছেন, তাঁদের পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁরা যা পেয়েছেন, তা তাঁকে নিবেদন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। যখন এই প্রকার কৃতজ্ঞতা কোন পরিবার, রাষ্ট্র বা সমাজের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তখন তাঁদের বাসস্থান জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে প্রায় বৈকুণ্ঠের মতো হয়ে ওঠে। এই যুগে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাকে স্বীকার করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করা। যার কাছে যা কিছু আছে তা সবই ভগবানের কৃপার দান বলে মনে করা উচিত। তাই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। কেউ যদি গৃহস্থরূপে, নাগরিকরূপে, মানব-সমাজের সদস্যরূপে সুখী হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে হবে।

শ্লোক ৩২

বর্হিষ্মতীং নাম বিভুর্যাং নির্বিশ্য সমাবসৎ ।
তস্যাং প্রবিষ্টো ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৩২ ॥

বর্হিষ্মতীম্—বর্হিষ্মতী নগরী; **নাম**—নামক; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী স্বায়ম্ভুব মনু; **যাম্**—যা; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **সমাবসৎ**—পূর্বে যেখানে তিনি বাস করেছিলেন; **তস্যাম্**—সেই নগরীতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ভবনম্**—প্রাসাদে; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ; **বিনাশনম্**—বিনাশ করে।

অনুবাদ

যে বর্হিষ্মতী নগরীতে মনু পূর্বে বাস করতেন, সেখানে আগমন করে তিনি ত্রিতাপ দুঃখ-নাশক প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

জড় জগৎ বা জড়-জাগতিক অস্তিত্ব—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ দুঃখে পূর্ণ। মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করার মাধ্যমে এক চিন্ময় পরিবেশের সৃষ্টি করা। জড়-জাগতিক ক্লেশ কৃষ্ণভাবনাকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না। এমন নয় যে, কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করলে, জড়-জাগতিক তাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়; প্রকৃত পক্ষে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা কৃষ্ণভক্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা বন্ধ করা যায় না, কিন্তু কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে এক বীজাণু নিবারক পদ্ধতি, যা জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্টের প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করে। কৃষ্ণভক্তের কাছে স্বর্গে বাস করা অথবা নরকে বাস করা সমান। স্বায়ম্ভুব মনু কিভাবে জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্টের প্রভাব থেকে মুক্ত এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

সভার্যঃ সপ্রজঃ কামান্ বুভুজেঽন্যাবিরোধতঃ ।
সঙ্গীয়মানসৎকীর্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ ।
প্রত্যূষেষ্বনুবদ্ধেন হৃদা শৃণ্বন্ হরেঃ কথাঃ ॥ ৩৩ ॥

স-ভার্যঃ—তাঁর পত্নী সহ; **স-প্রজঃ**—তাঁর প্রজাগণ সহ; **কামান্**—জীবনের আবশ্যকতাগুলি; **বুভুজে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **অন্য**—অন্যদের থেকে; **অবিরোধতঃ**—বিরোধিতা-শূন্য; **সঙ্গীয়মান**—প্রশংসিত হয়ে; **সৎ-কীর্তিঃ**—পুণ্য কর্মের জন্য খ্যাতি; **স-স্ত্রীভিঃ**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **সুর-গায়কৈঃ**—স্বর্গীয় গায়কদের দ্বারা; **প্রতি-ঊষেষু**—প্রতিদিন প্রাতঃকালে; **অনুবদ্ধেন**—আসক্ত হয়ে; **হৃদা**—হৃদয়ের দ্বারা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **কথাঃ**—বর্ণনা।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী এবং প্রজাগণ সহ জীবন উপভোগ করেছিলেন, এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, তিনি তাঁর বাসনাসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। সস্ত্রীক সুরগায়কেরা তাঁর সৎ কীর্তিসমূহের গান করতেন, এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে, তিনি প্রেমাসক্ত চিত্তে ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করতেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পূর্ণতা উপলব্ধি করা। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা সহ বাস করায় কোন আপত্তি নেই, তবে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের বিরোধী জীবন যাপন করা উচিত নয়। বৈদিক নিয়ম এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, এই জড় জগতে আগত জীবেরা তাদের জড় কামনা-বাসনাগুলি চরিতার্থ করে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

এখানে বোঝা যায় যে, সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু এই সমস্ত নিয়ম পালন করে, গার্হস্থ্য জীবন উপভোগ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিদিন প্রত্যূষে গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন, এবং সম্রাট সপরিবারে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ শ্রবণ করতেন। ভারতবর্ষে কোন কোন রাজপরিবারে এবং মন্দিরে এই প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে। পেশাদারি সঙ্গীতজ্ঞেরা সানাই বাজিয়ে গান করেন, এবং গৃহের সদস্যেরা এক মনোরম পরিবেশে ঘুম থেকে জেগে উঠে শয্যা ত্যাগ করেন। ঘুমোতে যাওয়ার সময়েও সঙ্গীতজ্ঞেরা সানাই বাজিয়ে ভগবানের লীলা-বিষয়ক গান করেন, এবং গৃহবাসীরা ভগবানের মহিমা স্মরণ করতে করতে নিদ্রিত হন। এই সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও, প্রতিটি গৃহে, সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা থাকে; এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে পরিবারের সদস্যেরা একত্রিত হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতার বর্ণনা শ্রবণ করেন এবং সুন্দর সঙ্গীত উপভোগ করেন। এই সংকীর্তনের প্রভাবে যে-পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা তাঁদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে, এবং নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনের স্বপ্ন দেখেন। এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণতা লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি থেকে জানা যায় যে, এই প্রথা অতি প্রাচীন, লক্ষ-লক্ষ বছর আগেও স্বায়ম্ভুব মনু কৃষ্ণভাবনামৃতের শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ পরিবেশে গৃহস্থ-জীবন যাপন করার এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিটি রাজপ্রাসাদে এবং ধনী ব্যক্তির গৃহে একটি সুন্দর মন্দির থাকত, এবং গৃহের সদস্যেরা প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মন্দিরে গিয়ে ভগবানের মঙ্গল আরতি দর্শন করতেন। মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠানটি হচ্ছে প্রত্যূষে ভগবানের প্রথম পূজা। আরতি অনুষ্ঠানে ভগবানকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদীপ দেখানো হয়, এবং শঙ্খ, পুষ্প ও চামর নিবেদন করা হয়। ভগবান প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে হালকা কিছু খাবার খেয়ে, তাঁর ভক্তদের দর্শন দান করেন। তার

পর ভক্তেরা তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন কিংবা মন্দিরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। প্রাতঃকালীন এই অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের মন্দির এবং প্রাসাদগুলিতে এখনও অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরগুলি হচ্ছে জনসাধারণের সমবেত হওয়ার স্থান। প্রাসাদের ভিতরে যে মন্দির, সেইগুলি বিশেষভাবে রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য, কিন্তু অনেক প্রাসাদের মন্দিরে সাধারণ জনগণও যেতে পারে। জয়পুরের রাজার মন্দির প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু জনসাধারণ সেখানেও সমবেত হতে পারে; কেউ যদি সেখানে যান, তা হলে তিনি দেখবেন যে, মন্দিরে সব সময় প্রায় পাঁচশ ভক্ত ভিড় করে থাকেন। মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠানের পর, তাঁরা একত্রে বসে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন। *ভগবদ্গীতাতেও* রাজপরিবারের মন্দিরে ভগবানের পূজা করার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি এই জীবনে ভক্তিযোগের পূর্ণ সাফল্য অর্জন নাও করতে পারেন, তা হলে তিনি পরবর্তী জীবনে ধনী বণিকের গৃহে অথবা রাজপরিবারে অথবা ব্রাহ্মণ বা ভক্তের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। কেউ যদি এই সমস্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল পরিবেশের সুযোগ লাভ করেন। কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে যখন কোন শিশুর জন্ম হয়, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করতে পারে। যে-সাফল্য তিনি পূর্বজন্মে লাভ করতে পারেননি, এই জীবনে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

নিষ্ণাতং যোগমায়াসু মুনিং স্বায়ম্ভুবং মনুম্ ।
যদাভ্রংশয়িতুং ভোগা ন শেকুর্ভগবৎপরম্ ॥ ৩৪ ॥

নিষ্ণাতম্—মগ্ন; যোগ-মায়াসু—ক্ষণিক সুখভোগে; মুনিম্—মুনিতুল্য; স্বায়ম্ভুবম্—স্বায়ম্ভুব; মনুম্—মনু; যৎ—যা থেকে; আভ্রংশয়িতুম্—অভিভূত হয়ে; ভোগাঃ—জড় ভোগ; ন—না; শেকুঃ—সক্ষম হয়েছিল; ভগবৎ-পরম্—যিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান ভক্ত।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন একজন রাজর্ষি। যদিও তিনি জড় সুখভোগে লিপ্ত ছিলেন, তবুও সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে জড় সুখ উপভোগ করার জন্য তিনি নিকৃষ্টতম জীবনে অধঃপতিত হননি।

তাৎপর্য

রাজকীয় জড় সুখ সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের ফলে কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের জীবনে অর্থাৎ পশু-জীবনে অধঃপতিত করে। কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনুকে একজন রাজর্ষি বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কেননা তাঁর রাজ্যে এবং তাঁর গৃহে তিনি যে-পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছিল পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়। সাধারণত বদ্ধ জীবের অবস্থাও তেমনই; তারা এই জড় জগতে এসেছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য, কিন্তু এখানকার বর্ণনা অনুসারে অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, মন্দিরে অথবা গৃহে ভগবানের আরাধনা করার মাধ্যমে তারা যদি এক কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে তারা নিঃসন্দেহে জড় সুখভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে প্রগতি লাভ করতে পারে। বর্তমান সভ্যতা জড় জাগতিক জীবন এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সাধারণ মানুষকে জড় সুখভোগের মধ্যেও মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার করার সর্ব শ্রেষ্ঠ সুযোগ দান করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত তাদের জড় সুখভোগের প্রবণতাকে রোধ করে না, পক্ষান্তরে তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জীবনের অভ্যাসগুলিকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করে। জড় সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করা সত্ত্বেও, তারা এই জীবনেই, কেবল মাত্র ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' কীর্তন করার সরল পন্থার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ৩৫

অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ ॥ ৩৫ ॥

অযাত-যামাঃ—সময় নষ্ট হয়নি; **তস্য**—মনুর; **আসন্**—ছিল; **যামাঃ**—ঘণ্টা; **স্ব-অন্তর**—তাঁর আয়ু; **যাপনাঃ**—যাপন করে; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করে; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কুর্বতঃ**—আচরণ করে; **ব্রুবতঃ**—বলে; **কথাঃ**—লীলা-বিলাসের বর্ণনা।

অনুবাদ

তার ফলে, যদিও ধীরে ধীরে এক মন্বন্তর-ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ আয়ু সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্যও তার ব্যর্থ অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণ, মনন, লেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন।

তাৎপর্য

তাজা খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু তা যদি তিন চার ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়, তা হলে তা বাসি এবং বিস্বাদ হয়ে যায়, তেমনই জড় সুখ ততক্ষণই কেবল থাকে, যতক্ষণ দেহে যৌবন থাকে, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে সব কিছুই বিস্বাদ হয়ে যায়, এবং সব কিছুই অর্থহীন এবং বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর জীবন কিন্তু বিস্বাদ ছিল না; বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন নিরন্তর কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হওয়ার ফলে, প্রথম যৌবনের মতোই সজীব ছিল। কৃষ্ণভক্তের জীবন সর্বদাই নবীন। বলা হয় যে, সকালে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত মানুষের আয়ু হরণ করে। কিন্তু সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত মানুষের জীবন ক্ষয় করতে পারে না। স্বায়ম্ভুব মনু যেহেতু সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে এবং ভগবানের লীলা স্মরণে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর জীবন কিছুকাল পরে বিস্বাদ হয়ে যায়নি। তিনি ছিলেন সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী, কেননা কখনও তাঁর সময়ের অপচয় করেননি। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিক্ষোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ*। যখন তিনি কথা বলতেন, তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর কথাই বলতেন; তিনি যখন কিছু শ্রবণ করতেন, তিনি কেবল কৃষ্ণেরই কথা শ্রবণ করতেন; তিনি যখন ধ্যান করতেন, তখন কেবল শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর লীলা-বিলাসেরই ধ্যান করতেন।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর আয়ু ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, একাত্তর চতুর্যুগ। এক চতুর্যুগের স্থিতি হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ বৎসর, এবং এই রকম একাত্তরটি যুগ-ব্যাপী ছিল মনুর আয়ু। ব্রহ্মার এক দিনে এই রকম চৌদ্দজন মনুর আগমন হয়। মনু তাঁর সারা জীবন—৪৩,২০,০০০×৭১ বৎসর—কৃষ্ণের কথা কীর্তন করে, শ্রবণ করে, প্রচার করে এবং ধ্যান করে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়নি, এবং কখনও বিস্বাদও হয়ে যায়নি।

শ্লোক ৩৬

স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্ ।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (স্বায়ম্ভুব মনু); **এবম্**—এইভাবে; **স্ব-অন্তরম্**—তাঁর জীবন কাল; **নিন্যে**—অতিক্রম করেছিলেন; **যুগানাম্**—চতুর্যুগের; **এক-সপ্ততিম্**—একাত্তর; **বাসুদেব**—বাসুদেবের; **প্রসঙ্গেন**—সম্পর্কিত বিষয়ের; **পরিভূত**—অতিক্রম করেছিলেন; **গতি-ত্রয়ঃ**—তিনটি অবস্থা।

অনুবাদ

তিনি সর্বদা বাসুদেবের কথা চিন্তা করে এবং বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে যুক্ত থেকে, তাঁর জীবন কাল একাত্তর চতুর্যুগ (৭১×৪৩,২০,০০০ বৎসর) অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে তিনি গতিত্রয় অতিক্রম করেছিলেন।

তাৎপর্য

যারা জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন, গতিত্রয় তাদেরই জন্য। এই তিনটি গতিকে কখনও কখনও জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই তিনটি গতিকে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের গন্তব্য স্থল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়ে অধিক সুখময় জীবন লাভ করে, যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে অবস্থান করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা অধঃলোকে মনুষ্যেতর পাশবিক জীবনে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, তিনি জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণের অতীত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই জড়া প্রকৃতির গতিত্রয়ের অতীত হয়ে, ব্রহ্মভূত স্তরে বা আত্ম উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হন। স্বায়ম্ভুব মনু যদিও এই জড় জগতের শাসক ছিলেন, এবং আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে জড় সুখভোগে লিপ্ত বলে মনে হয়েছিল, তবুও তিনি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণে ছিলেন না, তিনি সেই সমস্ত অবস্থার অতীত ছিলেন।

তাই, যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত, তিনি সর্বদাই মুক্ত। ভগবানের এক মহান ভক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, "ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার যদি একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে, তা হলে মুক্তিদেবী সর্বদাই আমার সেবায় যুক্ত থাকবেন। ধর্ম, অর্থ আদি জড় সিদ্ধিগুলি আমার বশীভূত হবে।" মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে। সাধারণত তারা ধর্ম আচরণ করে জাগতিক অর্থ লাভের জন্য, এবং তারা তখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে, তারা মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য এই চতুর্বর্গ হচ্ছে পারমার্থিক পথ। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান, তাঁরা এই চতুর্বর্গের তথাকথিত পরমার্থ সাধনে কোন রকম চেষ্টা না করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ মুক্তিরও অতীত চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। ভক্তের কাছে মুক্তি খুব একটা

বড় প্রাপ্তি নয়, অতএব ধর্ম, অর্থ এবং কামের চরিতার্থতার কথা কি আর বলার আছে? ভগবদ্ভক্ত কখনও এইগুলির অপেক্ষা করেন না। তাঁরা সর্বদাই আত্ম উপলব্ধির ব্রহ্মভূত অবস্থার চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৩৭

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

শারীরাঃ—দেহ সম্বন্ধীয়; **মানসাঃ**—মন সম্বন্ধীয়; **দিব্যাঃ**—দিব্য শক্তি সম্বন্ধীয়; **বৈয়াসে**—হে বিদুর; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **মানুষাঃ**—অন্য মানুষদের সম্বন্ধীয়; **ভৌতিকাঃ**—অন্যান্য জীব সম্বন্ধীয়; **চ**—এবং; **কথম্**—কিভাবে; **ক্লেশাঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **বাধন্তে**—পীড়া দিতে পারে; **হরি-সংশ্রয়ম্**—যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

অতএব, হে বিদুর! যাঁরা ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শারীরিক, মানসিক, দৈবিক এবং অন্যান্য মানুষ ও জীবদের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ কিভাবে পীড়া দিতে পারে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই দৈহিক, মানসিক, অথবা প্রাকৃতিক ক্লেশের দ্বারা প্রতিনিয়তই পীড়িত। শীতকালের প্রচণ্ড শীত এবং গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম এই জড় জগতের জীবদের সর্বদাই ক্লেশ প্রদান করে, কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তিনি এই সমস্ত অবস্থার অতীত; তিনি কখনই কোন দৈহিক, মানসিক, অথবা শীত এবং গ্রীষ্ম আদি প্রাকৃতিক ক্লেশের দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি এই সমস্ত ক্লেশের অতীত।

শ্লোক ৩৮

যঃ পৃষ্টো মুনিভিঃ প্রাহ ধর্মান্নানাবিধাঞ্ছুভান্ ।
নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাং চ সর্বভূতহিতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

যঃ—যিনি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **মুনিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **ধর্মান্**—কর্তব্যসমূহ; **নানা-বিধান্**—বিভিন্ন প্রকার; **শুভান্**—মঙ্গলজনক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজে; **বর্ণ-আশ্রমাণাম্**—বর্ণ এবং আশ্রমের; **চ**—এবং; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবেদের; **হিতঃ**—মঙ্গল সাধনকারী; **সদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে তিনি (স্বায়ম্ভুব মনু) সাধারণ মানুষের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের নানাবিধ পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

এতত্ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **তে**—আপনাকে; **আদি-রাজস্য**—প্রথম সম্রাটের; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **চরিতম্**—চরিত্র; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **বর্ণিতম্**—বর্ণনা করা হয়েছে; **বর্ণনীয়স্য**—যাঁর যশ বর্ণনার যোগ্য; **তৎ-অপত্য**—তাঁর কন্যার; **উদয়ম্**—প্রভাব; **শৃণু**—দয়া করে শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

আমি কীর্তনের যোগ্য আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন তাঁর কন্যা দেবহূতির প্রভাবের বর্ণনা শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।